খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো এবং সিলেটের পাথর কোয়ারিসৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয়

ওমর ফারুক

বাংলাদেশে মাটির নীচে, নদীতীরে, সমুদ্র সৈকতে বিভিন্ন ধরনের ও পরিমাণে মূল্যবান খনিজ সম্পদ আছে। বড় বড় খনি নিয়ে যেমন নানামুখি চক্রান্ত আছে তেমনি বিভিন্ন স্থানীয় পর্যায়ে বালি পাথর নিয়ে চলছে দখলদারদের তান্ডব। আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ কোনকিছুরই তোয়াক্কা নেই। এই পর্যবেক্ষণমূলক নিবন্ধে সিলেটের একটি নির্দিষ্ট ঘটনার সূত্র ধরে প্রশাসন, মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ যমুনা টেলিভিশনে Investigation 360 Degree নামের অনুষ্ঠানে সিলেটের পাথর কোয়ারি নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। ওই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হলেও আইনি ও প্রশাসনিক দিকের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত না করায় আমি ছোট পরিসরে এই আলোচনা করতে আগ্রহী হয়েছি। এই আলোচনা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে বলে আশা করছি।

১.

প্রথমে আমি প্রতিবেদনে কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরছি। এরপরই আমি মূল প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব। সিলেটের গোয়াইনঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার তিনটি অঞ্চলে (জাফলং, বিছানাকান্দি ও ভোলাগঞ্জ) অপরিকল্পিত পাথর উত্তোলন নিয়ে অনুসন্ধান করে এতে স্থানীয় প্রশাসনিক পর্যায়ে দুর্নীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের সম্পৃক্ততার জটিল সম্পর্ক উন্মোচন করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে, কিভাবে রাজনৈতিক নেতাদের এবং স্থানীয় প্রশাসনের ইন্ধনে পুরো অঞ্চলে বসতবাড়ি ও চাষবাসের জমিজমা এবং আশপাশের পরিবেশ ধ্বংস করে একদিকে বিরান মরুভূমি, অন্যদিকে নদীর মতো তৈরি হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতাদের যেন কিছুই করার নেই। স্থানীয় প্রশাসনের প্রধান কর্তাব্যক্তি প্রকাশ্যেই তাঁর অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছেন।

> একাদশ তফসিল অনুযায়ী পাথরের ক্ষেত্রে খনিমুখে মূল্যের ১০% হারে রয়্যালটি নির্ধারিত করা আছে। জেলা প্রশাসক যদি কিছু না-ই জানেন তাহলে কি বুঝতে হবে যে খনি ও খনিজ বিধিমালা ২০১২-এর ৭৬-৮২ ধারাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই এ অঞ্চলে পাথর উত্তোলন চলছে?

প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে গ্রামের পর গ্রামে বসতভিটা ও অন্যান্য জমিজমা থেকে গর্ত করে পাথর উত্তোলন করে প্রায় নদীর মতো তৈরি করে ফেলা হয়েছে। পুরো গ্রাম নদী হয়ে গেছে; পাথর তোলার গর্ত বড় হতে হতে এই পরিস্থিতি হয়েছে। অপরিকল্পিত পাথর উত্তোলনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পুরো জনপদ। রাস্তাঘাট, স্কুল, উপাসনালয়– সবই ভেঙে চুরমার। এলাকার মানুষ পাথর উত্তোলনকারীর কাছে জমি লিজ দেয়; উত্তোলনকারী কয়েক বছর ধরে পাথর উত্তোলন করে; এ সময়ে জমির মালিক তাঁর বসতি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরিয়ে নেন। উত্তোলন শেষে আবার তিনি আগের স্থানে ফিরে আসেন। অথচ পাথর কোয়ারি করার জন্য দেশে আইনি কাঠামো আছে, যা পরে আলোচনা করা হয়েছে। এলাকার মানুষ যদি পাথর উত্তোলনকারীর কাছে জমি লিজ দিতে পারে, তাহলে তা খনিজ বিধিমালার আলোকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কোয়ারি থেকে উত্তোলিত পাথরের রয়্যালটি কিভাবে কোন আইনে আদায় করা হয়, তা নিয়ে প্রতিবেদন থেকে কিছু জানা যায়নি। তবে এই প্রতিবেদন দেখে মনে হচ্ছে, পুরো অঞ্চল তছনছ হয়ে গেছে; বসবাস কিংবা চাষের মতো অবস্থা নেই। পরিবেশগত বিপর্যয় হচ্ছে, অথচ সরকারি কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেই।

পাথর উত্তোলনকারীরা ড্রেজিং মেশিন (স্থানীয়ভাবে যা 'বোমা মেশিন' নামে পরিচিত) ব্যবহার করে পরিবেশের ক্ষতি করে পাথর উত্তোলন করছে। পরিবেশ বিষয়ক এনজিও 'বেলা'-র (বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লইয়ারস অ্যাসোসিয়েশন) রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ হাইকোর্ট ২০১০ সালে ড্রেজিং মেশিন দ্বারা পাথর উত্তোলন নিষিদ্ধ করেছেন। এ সত্ত্বেও নির্বিচারে পাথর উত্তোলন চলছেই। একই সাথে কোর্ট পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে আদেশ দিয়েছেন অপরিকল্পিত পাথর উত্তোলন বন্ধে নীতিমালা তৈরির জন্য। মজার ব্যাপার হলো, গত চার বছরে সেই নীতিমালা তৈরি হয়নি বলে গত বছর নভেম্বরে ঢাকা ট্রিবিউন পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ উচ্চ আদালতের আদেশের পর গত পাঁচ বছরে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় তথা পরিবেশ অধিদপ্তরের কাজের কোনো অগ্রগতি নেই। ভোলাগঞ্জে বাংলাদেশ রেলওয়ের ৩৬০ একর জমিতে অবস্থিত স্থাপনায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেই অবৈধ উপায়ে পাথর উত্তোলন চলছে। পুরো পাথর উত্তোলন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে রাজনৈতিক মদদপুষ্ট মাস্তান বাহিনী। তবে প্রশাসনের নাকের ডগায় তাদের ইশারা ছাড়া এটি চলছে সেটা অনুমান করা কি ঠিক হবে? Investigation 360 Degree- এর প্রতিবেদকের সাথে আলাপকালে 'বেলা'র নির্বাহী পরিচালক বলেছেন যে পাথর উত্তোলন ও ভাঙার পুরো প্রক্রিয়া জাফলংবাসীদের জন্য অভিশাপ হিসেবে দেখা দিয়েছে। উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এটি অব্যাহত আছে। তাঁর মতে, *দেশের প্রচলিত আইন ও আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী এটা চলতে পারে না।*

ওই প্রতিবেদনে সিলেটের জেলা প্রশাসক, পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক, স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং পাথর উত্তোলনকর্ম নিয়ন্ত্রণকারী তিন বাহিনীর প্রধানদের সাক্ষাৎকার

নেওয়া হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক নানা সময়ে অভিযান চালালেও এর সাথে জড়িত কাউকেই আইনের আওতায় আনতে পারেননি। জেলা প্রশাসক বললেন যে, তিনি এই পাথর উত্তোলন প্রক্রিয়া সম্পর্কেই জানেন না; কিভাবে এটা কারা উত্তোলন করে তা সম্পর্কে তাঁর কিছুই জানা নেই। স্থানীয় সংসদ সদস্যও একই কথা বললেন। জেলা প্রশাসক বললেন যে তিনি শুধু 'খাস কালেকশনের' বিষয়টি দেখেন। পাথর বহনকারী ট্রাক থেকে পাথরের পরিমাণ দেখে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করেন। তবে পাথর উত্তোলন নিয়ন্ত্রণকারী এক বাহিনীপ্রধান জানালেন যে প্রতিদিন চার-পাঁচ লাখ টাকা আদায় হলেও মাত্র এক লাখ টাকা জমা হয় সরকারি কোষাগারে। প্রতিবেদনে এই 'খাস কালেকশন' বিষয়ে বিস্তারিত কিছুই অনুসন্ধান করা হয়নি; কী হারে কোন প্রক্রিয়ায় এটি আদায় হয়, এর আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াই বা কী, এ নিয়ে কোনো কথা বলা হয়নি।

'বেলা'র নির্বাহী পরিচালক দেশের প্রচলিত আইনের কথা বললেও এটি পরিষ্কার হয়নি যে কোন আইন বা আদেশের কথা তিনি বলেছেন। প্রতিবেদকও এ বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান করেননি। সব শেষে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, কেননা এই অপরিকল্পিত পাথর উত্তোলনের কারণে জাফলং এলাকার পর্যটন কেন্দ্রের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। মন্ত্রী জানালেন যে, এটা মেনে নেওয়া যায় না। পরিবেশ মন্ত্রণালয়, পর্যটন মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয় বসে ঠিক করবে এটা কী করে সমাধান করা যায়। এ ব্যাপারে সিলেটের জেলা প্রশাসককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানালেন।

২.

এবার আসি মূল প্রসঙ্গে। ওপরের এই কাহিনী আমি কেন বর্ণনা করলাম? আমি শিরোনামে উল্লেখ করেছি খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো সম্পর্কে। অবাক করার মতো বিষয় হলো, যমুনা টিভির এই প্রতিবেদনে কেউ বাংলাদেশ সরকারের এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেনি। বাংলাদেশ হাইকোর্ট গাইডলাইন প্রণয়নের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে; অথচ পাথর কোয়ারির নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হলো জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো। এটি সরকারের রাজস্ব অর্জনকারী একটি প্রতিষ্ঠান। খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের জন্য লাইসেন্স ও জমি লিজ প্রদান এবং এ সম্পর্কিত রাজস্ব আদায় এর প্রধান কাজ। পরিবেশ অধিদপ্তরের কাজ পরিবেশ বিষয়ক ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান করা। খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কোয়ারি তৈরির লাইসেন্স দেবে এবং ভূমি লিজের ব্যাপারে সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আরো অবাক করার মতো বিষয় হলো, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রীর কথিত তিন মন্ত্রণালয়ের মধ্যকার সমন্বয়ের মধ্যে মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ই নেই। 'বেলা'র নির্বাহী পরিচালকও বলেননি খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো এবং খনি/কোয়ারি সম্পর্কিত ২০১২ সালের খনি ও খনিজ বিধিমালা সম্পর্কে। পাথর কোয়ারি সম্পর্কিত আলোচনায় কোয়ারি ইজারা প্রদানের আইনগত দিক হলো প্রথম বিষয় আর পরিবেশদূষণ দ্বিতীয় বিষয়। এ দুটোকে আলাদা করে দেখা অর্থহীন। আমার ধারণা, 'বেলা'র এ বিষয়ক অ্যাডভোকেসি কর্মসূচিতে দ্বিতীয় বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বস্তুত খনি ও খনিজ বিধিমালা ২০১২ (যা এর আগে খনি ও খনিজ বিধিমালা ১৯৬৮ নামে পরিচিত ছিল) অনুসারেই দেশের সব রকমের খনিজ পদার্থ (তেল ও গ্যাস ছাড়া) উত্তোলনের জন্য খনি/কোয়ারির লাইসেন্স ও লিজ প্রদান নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বিধিমালার অধ্যায় চারে কোয়ারি সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া আছে। বিধিমালার বিধি ৭৮ অনুসারে কোয়ারি ইজারা প্রদানের জন্য খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর পরিচালক উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ইজারা প্রদান করবেন। অথচ জেলা প্রশাসক কিংবা সংসদ সদস্য কেউই জানেন না কিভাবে পাথর উত্তোলন প্রক্রিয়া চলে আসছে। জেলা প্রশাসক যদি এ সম্পর্কেই কিছু না জানেন তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, 'খাস কালেকশন' তিনি কিসের ভিত্তিতে করেন? কোন নির্দেশনা অনুযায়ী, কোন আইনের আওতায় তিনি এটা আদায় করেন? কিংবা এই অর্থ কোন প্রক্রিয়ায় সরকারি কোষাগারে জমা হয়?

> যেহেতু বেশির ভাগ এলাকায় আইনসম্মতভাবে ইজারা প্রদান হয়নি, তাই খাস ভূমি হিসেবে অর্থ আদায় হয়ে থাকে এবং এতে হয়তো দুর্নীতিরও ব্যাপক সুযোগ থাকে। যেমন পাথর উত্তোলনকারী এক বাহিনীপ্রধান অভিযোগ করলেন যে দৈনিক চার-পাঁচ লাখ টাকা আদায় হলেও এক লাখ টাকা কোষাগারে জমা হয়।

অথচ খনি ও খনিজ বিধিমালা ২০১২-এর নানা বিধিতে সুস্পষ্টভাবে জেলা প্রশাসকের নানা দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। যেমন : বিধি ৭৭ (২)-এ বলা আছে, "*রয়্যালটি প্রদান বা কোয়ারী ইজারা মূল্য এবং অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মতামত/সুপারিশ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এককালীন অনূর্ধ্ব ১ বৎসরের জন্য ইজারা নবায়ন করিতে পারিবেন এবং ইজারাগ্রহীতার নবায়নের আবেদন কোন অধিকার হিসাবে গণ্য করা হইবে না।*" এ থেকেও বোঝা যায়, জেলা প্রশাসক এ বিষয়ে কোনো কিছু না জানার কথা নয়। আবার বিধি ৮১-তে বলা আছে, "*উত্তোলিত খনিজ পদার্থের জন্য [বিধিমালার] একাদশ তফসিলে বর্ণিত হারে রয়্যালটি প্রদান করিবেন এবং এই জাতীয় রয়্যালটি পরিশোধপূর্বক পরিচালকের নিকট যথাযথ যাচাইকৃত ট্রেজারী চালানের মূল কপি জমা দিবেন।*" উল্লেখ্য, একাদশ তফসিল অনুযায়ী পাথরের ক্ষেত্রে খনিমুখে মূল্যের ১০% হারে রয়্যালটি নির্ধারিত করা আছে। জেলা প্রশাসক যদি কিছু না-ই জানেন তাহলে কি বুঝতে হবে যে খনি ও খনিজ বিধিমালা ২০১২-এর ৭৬-৮২ ধারাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই এ অঞ্চলে পাথর উত্তোলন চলছে?

জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব সম্পর্কিত আরেকটি বিষয় সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার। ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে Investigation 360 Degree- এর প্রতিবেদককে জেলা প্রশাসক বললেন, "*তিনি শুধু 'খাস কালেকশনের' বিষয়টি দেখেন। পাথর বহনকারী ট্রাক থেকে পাথরের পরিমাণ দেখে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করেন।*" তিনি যে 'খাস কালেকশন' কথাটি ব্যবহার করেছেন তা বিভ্রান্তিমূলক। একজন জেলা প্রশাসক তো

আইনের ভাষায় বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারার কথা। এর দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে। তিনি কোয়ারি থেকে উত্তোলিত পাথরের জন্য খনিজ বিধিমালার একাদশ তফসিল মোতাবেক 'রয়্যালটি' আদায় করেন। হয়তো 'রয়্যালটি'র স্থানীয় পরিভাষা হিসেবে 'খাস কালেকশন' কথাটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'খাস কালেকশন' কথাটি আরেকটি বিষয় নির্দেশ করে। খনিজ বিধি মোতাবেক কোয়ারি ইজারা প্রদান করে আইনসম্মতভাবে 'রয়্যালটি' আদায় না করে কোয়ারি এলাকা খাস ভূমি হিসেবে গণ্য করে জেলা প্রশাসক অর্থ আদায় করেন। কেননা বিধি ৯৫-এ বলা হয়েছে : *"বিধি ৭৮ এ নির্দেশিত সময়ের মধ্যে সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর এবং বালুমিশ্রিত পাথর ইত্যাদির কোয়ারী ইজারা প্রদান না করা হইলে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক ব্যুরোর পক্ষে উক্ত কোয়ারী এলাকায় খাস ভূমি হিসাবে অর্থ আদায় করিবেন এবং ব্যুরোর নির্দিষ্ট কোডে উহা জমা করিবেন।"*

Investigation 360 Degree-র প্রতিবেদনে এটি তুলে ধরা হয়নি যে 'রয়্যালটি' বাবদ আদায়কৃত অর্থ এবং খাস ভূমি থেকে প্রাপ্ত অর্থের মধ্যে কী ধরনের পার্থক্য হয়ে থাকতে পারে। আমার ধারণা, যেহেতু বেশির ভাগ এলাকায় আইনসম্মতভাবে ইজারা প্রদান হয়নি, তাই খাস ভূমি হিসেবে অর্থ আদায় হয়ে থাকে এবং এতে হয়তো দুর্নীতিরও ব্যাপক সুযোগ থাকে। যেমন পাথর উত্তোলনকারী এক বাহিনীপ্রধান অভিযোগ করলেন যে দৈনিক চার-পাঁচ লাখ টাকা আদায় হলেও এক লাখ টাকা কোষাগারে জমা হয়। অবশ্য তাঁর এই কথার পক্ষে প্রতিবেদকের অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত কোনো তথ্য উল্লেখ করা হয়নি।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো এবং পরিবেশ অধিদপ্তর যদি দেশীয় ছোটখাটো কোয়ারি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাই করতে না পারে তাহলে বিদেশি কোম্পানির প্রস্তাবিত বৃহৎ ও জটিল আকারের প্রকল্পের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কাজ তদারকি এদের দিয়ে কিভাবে সম্পন্ন হবে? নাকি বড় ধরনের পরিবেশ বিপর্যয় তৈরি হলেও কেউ দেখবার থাকবে না?

পরিবেশের ক্ষতির জন্য ব্যুরোর পরিচালক খনি ও খনিজ বিধিমালা ২০১২-এর ধারা ৮৪ অনুযায়ী লাইসেন্স বা ইজারা বাতিল ও স্থগিত করতে পারেন। তবে যদি আইন অনুযায়ী লাইসেন্স ও লিজ দেওয়াই না হয় তাহলে তিনি বাতিল বা স্থগিত করবেন কী? পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশদূষণ মোকাবিলা করার জন্য ব্যুরোর পরিচালককে দিয়েই এ ব্যবস্থা নিতে পারেন। সর্বোপরি ব্যুরোর পরিচালক তো জেলা প্রশাসককে দিয়েই সব কাজের সমন্বয় করবেন; অথচ তিনিই কিনা জানেন না কিভাবে কী হচ্ছে। কী অদ্ভুত কাণ্ড! এ বিষয়গুলো নিয়ে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর কোনো তদারকি আছে বলে তো মনে হয় না। থাকলেও তা Investigation 360 Degree- এর এই প্রতিবেদনে আলোচিত হয়নি।

সিলেটের আকর্ষণীয় পর্যটন এলাকা এবং এর আশপাশের জনপদ ও পরিবেশের বিশাল ক্ষতি করে অপরিকল্পিত পাথর উত্তোলনের ব্যাপক কর্মযজ্ঞ প্রশাসনের নাকের ডগায় বেআইনিভাবে পরিচালিত হচ্ছে বলেই মনে হয়। বেলার নির্বাহী পরিচালক এ কথা পরিষ্কার করে উল্লেখ করেছেন। সিলেটের পাঁচ উপজেলায় ৬০৬টি কোয়ারিতে বোমা মেশিন ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে ২১৩টির পরিবেশ ছাড়পত্র আছে আর বাকিগুলো বেআইনিভাবে চলছে। প্রতিবেদনে প্রচারিত চিত্র থেকে সহজেই বোঝা যায়, এই ছাড়পত্র অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না। পরিবেশ অধিদপ্তর কি অনুসন্ধান করেছে যে তাদের দেওয়া বিধিবিধান মানা হচ্ছে কি না? Investigation 360 Degree-র প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতাদের যোগসাজশে লুণ্ঠন প্রক্রিয়া চলছে, অথচ কেউ যেন কিছু দেখছে না। ২০০৯ থেকে ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশের বেশ কয়েকটি দৈনিকে এ নিয়ে নানা প্রতিবেদনও প্রচারিত হয়েছে। 'বেলা' এ বিষয়ে বেশ কিছু অ্যাডভোকেসি ও আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে। অথচ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো তথা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।

৩.

ওপরে আলোচিত তথ্যাবলি থেকে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। তা হলো Investigation 360 Degree প্রতিবেদনে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মদক্ষতার এক নির্মম চিত্র ফুটে উঠেছে। এটা বলা ভুল হবে না যে, এই দুটি প্রতিষ্ঠান পাথর কোয়ারি পরিচালনা তথা বাংলাদেশে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন এবং এ সম্পর্কিত পরিবেশ বিষয়ক জটিলতা ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো এবং পরিবেশ অধিদপ্তর যদি দেশীয় ছোটখাটো কোয়ারি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাই করতে না পারে তাহলে বিদেশি কোম্পানির প্রস্তাবিত বৃহৎ ও জটিল আকারের প্রকল্পের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কাজ তদারকি এদের দিয়ে কিভাবে সম্পন্ন হবে? নাকি বড় ধরনের পরিবেশ বিপর্যয় তৈরি হলেও কেউ দেখবার থাকবে না? সেই বিপর্যয় সিলেট অঞ্চলের কোয়ারিসৃষ্ট বিপর্যয় থেকে আরো ভয়াবহ হবে তা অনেকেরই জানা আছে।

আরেকটি অবাক করার মতো বিষয় হলো, কয়লা খনি সম্পর্কিত আলোচনায় খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা নিয়ে জনপরিসরে কোনো আলোচনাই নজরে আসেনি। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে গত ১১ বছর (২০০৫-১৫) ধরে কয়লা উত্তোলন নিয়ে নীতিনির্ধারণী মহলে এবং জনপরিসরে বিশদভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকের আলোকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা/বিতর্ক চলমান। অথচ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোই হলো খনি (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) এবং কোয়ারি বিষয়ক সকল আইনগত কর্মকাণ্ড দেখভাল করার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে খনিজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের এবং এবিষয়ে চলমান সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগঠকদের এ নিয়ে ভাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

ওমর ফারুক: বাংলাদেশের জ্বালানী সম্পদ বিষয়ে টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত পিএইচডি শিক্ষার্থী

ইমেইল: omarsoc@gmail.com